Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অমুসলিম দেশে মুসলমানদের অবস্থানের বিধান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

খাইরিয়া বেগম

রোলঃ 227021341

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অমুসলিম দেশে মুসলমানদের অবস্থানের বিধান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

খাইরিয়া বেগম

রোলঃ 227021341

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " অমুসলিম দেশে মুসলমানদের অবস্থানের বিধান " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে খাইরিয়া বেগম, আইডিঃ 227021341 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " অমুসলিম দেশে মুসলমানদের অবস্থানের বিধান " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Khairiyah

(স্বাক্ষর)

খাইরিয়া বেগম

আইডিঃ 227021341

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভুমিকা..1

প্রসঙ্গকথা..2

অমুসলিম দেশে মুসলিম বসবাসের বিধান 3

অমুসলিম রাষ্ট্রের প্রকার...4

অমুসলিম দেশে বসবাস জায়েজ এর দলিল 5

অমুসলিম দেশে বসবাস নাজায়েজ এর দলিল...6

অমুসলিম দেশে স্থায়ী বসবাস নাজায়েজ :সমসাময়িক ব্যাখ্যা..........................7

অমুসলিম দেশে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ...10

জ্ঞান অর্জনের জন্য সফর...11

ব্যাবসার জন্য সফর..12

চিকিৎসার জন্য সফর..14

পর্যটনের জন্য সফর..14

অমুসলিম দেশে দাওয়াতের জন্য সফর...15

দাওয়াতের জন্য সফর..**Error! Bookmark not defined.**

সাংস্কৃতিক সম্প্রতি ইসলামবিরোধী 19

অমুসলিম রাষ্ট্রে খাদ্য সংক্রান্ত বিধিনিষেধ 25

শরী'আতসম্মত জবেহের কিছু শর্ত...26

মুরগি জবেহের আধুনিক পদ্ধতি..26

আধুনিক মেশিনের সাহায্যে পশু জবেহের জটিলতা নিরসন..........................28

অমুসলিমদের সামাজিক অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা ও অংশগ্রহণ...........................29

অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা ও অংশগ্রহণ 30

অমুসলিমদের উপহার দেওয়া 32

পতাকার সম্মানে মাথা নোয়ানো...33

ইসলামে সাংস্কৃতিক ঐক্যের কোনো অবকাশ নেই.......................................33

রেফারেন্স 38

ভুমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য এবং দোয়া ও শান্তি বর্ষিত হোক সায়্যিদুল মুরসালীন,খাতামুন নাবিয়্যিন, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপর, এবং তাঁর সমস্ত পরিবার ও সাথীদের উপর।

বর্তমানে আমাদের দেশের প্রায় ১ কোটি ৫৫ লাখ মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন।আমাদের অনেকেরই আত্নীয়সজনদের মধ্যে প্রায়ই কেই পড়াশোনা,কেউ পর্যটনের জন্য আবার কেউ একটা উন্নত জীবনের আশায় অন্য দেশে পাড়ি জমান,সেটা মুসলিম দেশ হোক বা অমুসলিম দেশ, এদিকে ভ্রুক্ষেপ না করেই।
কিন্তু একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা বিষয়ের জন্যই আমরা কুরআন ও সুন্নাহের উপর নির্ভরশীল।
এই যে অমুসলিম দেশে যাওয়া,সেখানে স্থায়ী বা অস্থায়ী অবস্থান,
শরীয়ত এই ব্যাপারে কি বলে?জায়েজ না নাজায়েজ?
ইবাদতের ক্ষেত্রে কোনো দেশে আছে স্বাধীনতা, কোথাও কিছু সীমাবদ্ধতা। নামাজ ঠিক আছে, কিন্তু আজান দেওয়া যাবে না। ইদ করতে পারবেন, তবে কুরবানি চলবে না। টাকা রাখবেন, তবে সুদ মিশে যাবে। ভোট দিতে পারবেন, তবে অমুসলিমকে-কেননা মুসলিম প্রার্থীই নেই। এসব ব্যাপারে ইসলামের বিধান কী? কোন কাজ কী শর্তে কতটুকু বৈধ?
আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে শুকরিয়া যে তিনি "অমুসলিম দেশে মুসলিম অবস্থান করার বিধান"এই বিষয়ে সামান্য কিছু লিখার তাউফিক দিয়েছেন।তিনি এর মধ্যে যা ভুলক্রুটি যা কিছু আছে তা মাফ করুন এবং সংশোধন করে দিন এবং নেক আমল গুলো কবুল করে নিন।আমীন

প্রসঙ্গকথা

"অমুস্লিম দেশে মুসলিম অবস্থানের বিধান" এই বিষয়ে থিসিস লিখার কথা ছিলো না আমার।কিন্তু আল্লাহ পাক এটাই রিজিকে রেখেছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। এই বিষয়ে লিখতে সবচেয়ে বেশি যে ঘটনাটি উদ্ধোদ্ধ করেছে সেটি হলো "অমুসলিম দেশে বসবাসরত জনৈক আত্নীয় যে ঘর থেকে চলে গেছে কারন তার ইসলামী কালচার পছন্দ না,বরং ঐ দেশের কালচার পছন্দ এবং সে ডিপ্রেসড"।বিষয়টি আমাকে ভাবিয়েছে,কেনো কারো ইমানের রাজপথ থেকে এই বিচ্যুতি,পরিবার ও আত্নীয়দের মধ্যে বহুসংখ্যক সদস্য অমুসলিম দেশে বসবাসরত।বর্তমানে, সিলেটি প্রবাসীদের সংখ্যা প্রায় এক মিলিয়ন(১০ লক্ষ), প্রধানত যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জার্মানি, ইতালি, এবং মধ্যপ্রাচ্য এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলিতে কেন্দ্রীভূত।এবং বর্তমানে মুসলিম যারা অমুসলিম দেশে বসবাস করছেন তাদের মধ্যে ইসলাম শারয়ী বিভিন্ন বিষয়ে অজ্ঞতা ও অবহেলার দরুন তারা দ্বীন থেকে প্রতিনিয়ত দূরে সরে যাচ্ছেন।এমনকি ইসলামের ত্যাগের যে পরিসংখ্যান তাও বেশ উদ্যেগজনক। অপরদিকে,ইসলামের দাওয়াতের জন্য অমুসলিম দেশে দাওয়াতি উদ্যেগের গুরুত্ব রয়েছে।এই সব কিছুর সমাধান আসলে কি? শরীয়ত কি বলে?

এই থিসিস লিখতে আমি বিভিন্ন বই,পুস্তিকা,আর্টিকেল এর সাহাযো নিয়েছি এবং আমি চেষ্টা করেছি নিজের ক্ষুদ্র জ্ঞান এর আলোকে স্বকীয়তা বজায় রাখার।

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধেয় পিতামাতার প্রতি,
যারা প্রথম বার আমাকে কুরআনের তা'লীম
দিয়েছেন এবং
শ্রদ্ধেয় IOM এর উস্তায ও উস্তাযাদের প্রতি
যারা দিত্বীয়বার কুরআনকে জীবনে ধারন করার
তা''লিম দিয়েছেন।

অমুসলিম দেশে মুসলিম বসবাসের বিধান

ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন বিধান।কিয়ামত পর্যন্ত এটিই আল্লাহর নিকট সীকৃত জীবন বিধান।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন,

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। এবং যাদের প্রতি কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ, যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফরী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত। [সূরা আলে-ইমরান: 19]

তাই মানবজীবনের এমন কোনো সমস্যা নেই যার সমাধান শরীয়তে দেয়া হয়নি।কুরআন ও সুন্নাহের পরে সাহাবা, তাবেঈন, সালফে স্বলেহীন ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে আমাদের জীবনঘনিষ্ট সকল প্রকার মাসয়ালার সমাধান দিয়েছেন এবং বর্তমানেও প্রজ্ঞাবান আলেমরা সমাধান দিয়ে যাচ্ছেন।
সাধারণভাবে লক্ষ করা যায়, ইসলামের প্রথম যুগের অনেক বিধান পরবর্তী যুগে অবতীর্ণ বিধানের মাধ্যমে রহিত হয়ে গিয়েছে, সঙ্গত কারণেই তা হয়েছে। এভাবে আগের বিধানকে পরের বিধান রহিত করে দিতে পারে।

অবস্থান ও বসবাস সম্পর্কে শরিয়ত কী বলে, মুসলিম দেশ ছেড়ে অমুসলিম দেশে গিয়ে স্থায়ীভাবে থাকা এবং সেখানকার আইনের প্রতি আনুগত্য দেখানো কি জায়িজ? এ মাসআলার শরয়ি বিধান জানতে দুটি ভিত্তির ওপর চোখ রাখা আবশ্যক:

১. যে-অমুসলিম দেশে কোনো মুসলিম থাকছেন বা থাকতে চান, তাঁর জন সেখানকার আইনি ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডল কেমন হবে। অবস্থার পার্থক্যেন কারণে বিধানেও পার্থক্য ঘটবে।

২. সেখানে বসবাসের কারণ কী। কারণের পার্থক্যের জন্য বিধানও ভিন্ন হবে।

অমুসলিম রাষ্ট্রের প্রকার

ফকিহগন অমুসলিম দেশগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন এগুলোর জন্য আলাদা আলাদা বিধান বর্ণনা করেছেন।এখানে এ তিনটি ভাগের আওতায় আসা মাসআলাগুলোর সারাংশ তুলে ধরা হলো:

ক.এমন অমুসলিম রাষ্ট্র, যেখানে মুসলিমদের পক্ষে বাস করা খুবই কঠিন, যেখানে একজন মুসলমানের নিজের এবং তার পরিবার-পরিজনের দীন, ইমান, জান-মাল ও সম্মানের নিরাপত্তার কোনো নিশ্চয়তা নেই, ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই, যেখানকার পরিবেশ হিজরত-পূর্বকার মক্কিজীবনের মতোই ইসলামবিরুদ্ধ।

বিধান:এমন দেশে যাওয়া বা সেখানে বাস করা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়িজ। যে সেখানে আগে থেকে বাস করছে, কোনো মুসলিম বা নিরাপদ দেশে হিজরত করার সুযোগ থাকলে তার অবশ্যই তা করা উচিত।

তবে, যাদের সেখান থেকে বেরোনোর এবং উপযুক্ত কোনো স্থানে বসবাসের সামর্থ্য রয়েছে। অন্যথায় এমন রাষ্ট্রে যাওয়া ও বাস করা কীভাবে জায়িজ হতে পারে

খ.. এমন অনৈসলামিক রাষ্ট্র যেখানে ধর্ম পালনের স্বাধীনতা নেই, মুসলমানরা যেখানে বাস করেন দুর্বল সংখ্যালঘু হয়ে এবং মানহানির ঝুঁকি মাথায় নিয়ে। কিন্তু হিজরত করার মতো স্থান না থাকলে বা কোনো মুসলমান অন্যত্র সফরের ব্যয় বহনে সমর্থ না হলে সেখানে থেকে যাওয়াটা দোষের নয়।

বিধান: ফকিহরা একমত যে, এমন মুসলিমদের ওপর হিজরত ওয়াজিব নয়। এমন রাষ্ট্রে বসবাস তাদের জন্য গুনাহের কারণও নয়।

কিন্তু এ ছাড় শুধু এমন সময়ের জন্য, যখন তাদের পক্ষে হিজরতের কোনো উপায় থাকে না

গ. এমন অনৈসলামিক রাষ্ট্র, যেখানে মুসলিমদের জন্য সংখ্যালঘু হিসেবে বসবাস আশঙ্কাজনক নয় এবং ধর্মীয় স্বাধীনতাও আছে। নিজের বা নিজের বংশধরদের ইমান ও ইসলাম যেখানে রক্ষা করে চলা সম্ভব। এমন রাষ্ট্রে বসবাসের ব্যাপারে আলিমদের মতানৈক্য রয়েছে।

বিধান:হানাফি ও হাম্বলি আলিমদের মতে,, এমন রাষ্ট্রে বসবাস করা জায়িজ আছে। বসবাসরত মুসলিমদের জন্য সেখান থেকে হিজরত করা ওয়াজিব নয়। শাফিয়িদের প্রধান অভিমতও এটিই।

অমুসলিম দেশে বসবাস জায়েজ এর দলিল

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্নিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বলেন,

لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، وَلَكِن جهاد وبَيَّةً، وإذا اسْتَنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا

মক্কা বিজয়ের পর এখন আর হিজরত নেই। অবশ্য জিহাদ ও তার নিয়ত বাকি থাকবে। যখন জিহাদের জন্য তোমাদের আহ্বান করা হবে, তোমরা বেরিয়ে পড়বে।"

এ হাদিসের মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, মক্কা বিজয়ের পর যখন পুরো আরবে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল এবং মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে কোনো বাধা রইল না, তখন মদিনায় হিজরতের বিধান রহিত হয়ে গেছে।

১.আল্লামা খাত্তাবি ও শাওকানি রাহ. বলেন, ইসলামপূর্ব যুগে মুসলিমরা সংখ্যায় কম এবং বিচ্ছিন্ন ছিলেন বলে তাঁদের জন্য কোনো এক স্থানে একত্রে বসবাস করা আবশ্যক ছিল, মদিনায় হিজরতের বিধান দেওয়া হয়েছিল সেই সাময়িক উপকারার্থে। এরপর যখন মুসলিমদের সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে শক্তিও বেড়ে যায়, যা মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়, তখন মদিনায় হিজরতের এ বিধান তুলে নেওয়া হয়।

২.রাসুল মক্কা বিজয়ের আগে কোনো কোনো সাহাবিকে মক্কায় থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন। যেমন, আপন চাচা আব্বাস রা.-কে তিনি মক্কায় থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন। কারণ, তাঁর ব্যাপারে ধর্মীয় ফিতনার আশঙ্কা ছিল না। ব্যক্তিগত সম্মান এবং বংশীয় প্রভাব ও দৃঢ়তার কারণে কাফিররা তাঁর প্রাণ ও সম্পদের কোনো ক্ষতি করতে পারত না। এতে প্রমাণিত হয়, **অমুসলিম রাষ্ট্রে যদি ইমান-ইসলাম এবং জানমালের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকে,তাহলে বসবাসের অনুমতি রয়েছে।**

৩.

আল্লামা মাওয়ারদি রাহ, বলেন, যদি কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রে স্বাধীনভাবে ধর্মের ওপর আমলের সামর্থ্য থাকে, তাহলে সেটা ইসলামি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামি রাষ্ট্রের পরিবর্তে সেখানে বসবাস করা বেশি মর্যাদার বিষয়। কারণ, এতে ইসলামের দাওয়াত ও প্রচার-প্রসারের সম্ভাবনা বেশি।

অমুসলিম দেশে বসবাস নাজায়েজ এর দলিল

যেসব ফকিহ এমন দেশে বসবাসকে নাজায়িজ বলেন, তাঁদের মতামতের দলিল হলো:

ক. মুআবিয়া রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল বলেন:

لا تنقطع الهِجْرَةُ حَتَّى تنقطع التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ

الشَّمْسُ مِن مغربها হিজরত করার বিধান ততক্ষণ স্থগিত হবে না, যতক্ষণ না তাওবার দরজা বব হবে। আর তাওবার দরজা ততক্ষণ বন্ধ হবে না, যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে।(সুনানু আবি দাউদ: ২৪৭৯; তাবারানি: ৯০৭)

আবদুল্লাহ সাদি বর্ণনা করেন, রাসুল বলেছেন:

لا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ

হিজরত ততক্ষণ বন্ধ হবে না, যতক্ষণ কাফিরদের সঙ্গে জিহাদ চলতে থাকবে।(সুনানু নাসায়ি: ৪৮৬৬; সহিহ ইবনু হিব্বান: ৪৮৬৬।)

এসব বর্ণনা থেকে অনুমিত হয়, হিজরত কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। আর বাহাত এ বিধানের উদ্দিষ্ট লোকেরা হলেন অনৈসলামিক রাষ্ট্রের বাসিন্দা মুসলিমরাই। এজন্য তাঁদের সবার ওপর আবশ্যক, তাঁরা অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করবেন না; বরং হিজরতের ফরজের ওপর আমল করে সেখান থেকে স্থানান্তরিত হবেন। এ থেকে স্বতঃসিদ্ধভাবে এ বিধানও বেরিয়ে আসে যে, যখন অমুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থানরত মুসলিমদের এসব দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে, তখন মুসলিম রাষ্ট্র থেকে সেখানে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া কীভাবে সম্ভব?
বতীয় দলিল: দ্বিতীয় দলিল এমন সব বর্ণনার মাধ্যমে পেশ করা হয়, যা মুশরিকদের এলাকায় মুসলিমদেরকে বসবাস করতে নিষেধ করে এবং এদের থেকে দূরে থাকার আদেশ দেয়। জারির ইবনু আবদিল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল বলেছেন:

أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ

وَلِمَ؟ قَالَ : لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا

আমি সেসব মুসলিম থেকে দায়মুক্ত, যারা মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন- আল্লাহর রাসুল, কেন?
জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল বলেন:

لا تُسَاكِنُوا الْمُشْرِكِينَ وَلَا تُجَامِعُوْهُم فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أَوْ جَامَعَهُمْ فَلَيْسَ مِنَّا তোমরা মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করবে না এবং তাদের সঙ্গে একত্রে থাকবে না। যারা তাদের মধ্যে বসবাস করবে বা তাদের সঙ্গে একত্রে থাকবে, তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে, তারা আমাদের দলভুক্ত নয়।"

এসব বর্ণনা থেকে অমুসলিমদের সঙ্গে বসবাস করা পরিষ্কারভাবে হারাম প্রমাণিত হয়। কিন্তু সমস্যা হলো এ বর্ণনাগুলোও সমালোচনামুক্ত নয়। যেমন, জারির ইবনু আবদিল্লাহর হাদিসটি মুরসাল না মুত্তাসিল, এ নিয়ে মুহাদ্দিসদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম বুখারি, তিরমিজি ও আবু দাউদ রাহ, প্রমুখ তাঁর মুরসাল হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

অমুসলিম দেশে স্থায়ী বসবাস নাজায়েজ :সমসাময়িক ব্যাখ্যা

ইসলামের একটা বুনন আছে (মসজিদ-টাইম-সুযোগ তৈরি), একটা সামাজিক বুনন আছে (নামাযিদের মাঝে থাকা-বেনামাযির প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি), পারিবারিক বুনন আছে (বাবা-মায়ের কেয়ার, তিরস্কার ইত্যাদি), সেই সাথে ব্যক্তিক বুনন (দায়বদ্ধতা, অভ্যাস ইত্যাদি)। সবকটা বুনন মিলে ‘ইকামাতে সালাত’ হচ্ছে, সালাত প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। নামাযি বাড়ছে, বেনামাযি নামাযি হচ্ছে, নামাযি জামাআতের পাবন্দি করছে, সালাতকে জীবনে ধরে রাখছে। এভাবে দ্বীনের প্রত্যেকটা বিধানের পরতে পরতে বুনন আছে। এক পরত ছুটিয়ে দিলে বাকিগুলোও আস্তে আস্তে ছুটে যায়। কর্তৃপক্ষের লেভেলে সালাতের সহায়তা বাদ দিলে শেষে গিয়ে ব্যক্তিজীবনেও সালাত বিঘ্নিত হয়। গ্রামের দিকে অনেক জায়গায় এখনো বেনামাযিকে অন্যচোখে দেখা হয়, গোষ্ঠীর মধ্যে ভিন্ন নজরে দেখা হয়। সালাতের মতো একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় দিয়ে উদাহরণ দিলাম। অপেক্ষাকৃত বেশি সামাজিক বা পারিবারিক বিধানগুলো এখন মুসলিম দেশেই সেক্যুলারিতার কারণে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেখানে কাফির দেশে কীভাবে আপনারা ইসলাম ভালোভাবে পালনের দাবি করা কতটুকু বাঞ্চনীয়?

About a quarter of adults who were raised Muslim (23%) no longer identify as members of the faith, roughly on par with the share of Americans who were raised Christian and no longer identify with Christianity (22%), according to a new analysis of the 2014 Religious Landscape Study. But while the share of American Muslim adults who are *converts* to Islam also is about one-quarter (23%), a much smaller share of current Christians (6%) are converts. In other words, Christianity as a whole loses more people than it gains from religious switching (conversions in *both* directions) in the U.S., while the net effect on Islam in America is a wash.

In the United States: According to a 2017 Pew Research Center survey, 24% of people who were raised Muslim but have left Islam. The number of Muslims leaving Islam in the United States is roughly equal to the number of people converting to Islam.

In France: About 15,000 Muslims leave Islam each year.

2017 পিউ রিসার্চ সেন্টারের জরিপ অনুসারে, 24% মানুষ যারা মুসলিম হয়ে বেড়ে উঠেছেন কিন্তু ইসলাম ত্যাগ করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসলাম ত্যাগকারী মুসলমানের সংখ্যা মোটামুটিভাবে ইসলাম গ্রহণকারী লোকের সংখ্যার সমান।

ফ্রান্সে: প্রতি বছর প্রায় 15,000 মুসলমান ইসলাম ত্যাগ করে।

এবং তারা মানুষের ইসলাম ত্যাগ করার কিছু কারণ হল:

- ব্যক্তিগত বৃদ্ধির অভিজ্ঞতা, যেমন আরও শিক্ষিত হওয়া বা পরিপক্ক হওয়া

- ইসলামের শিক্ষার সাথে মতানৈক্য

- অন্যান্য ধর্ম বা দর্শনের জন্য অগ্রাধিকার

- সংগঠিত ধর্ম অপছন্দ

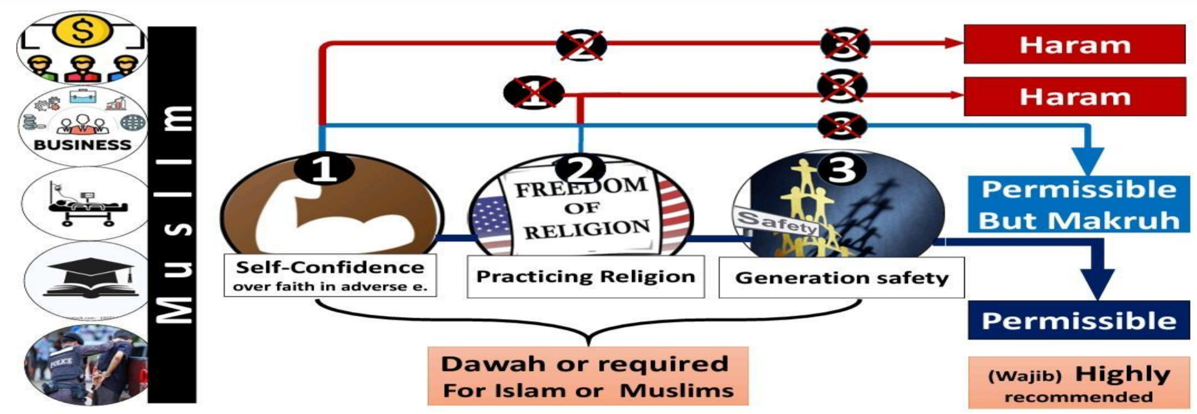

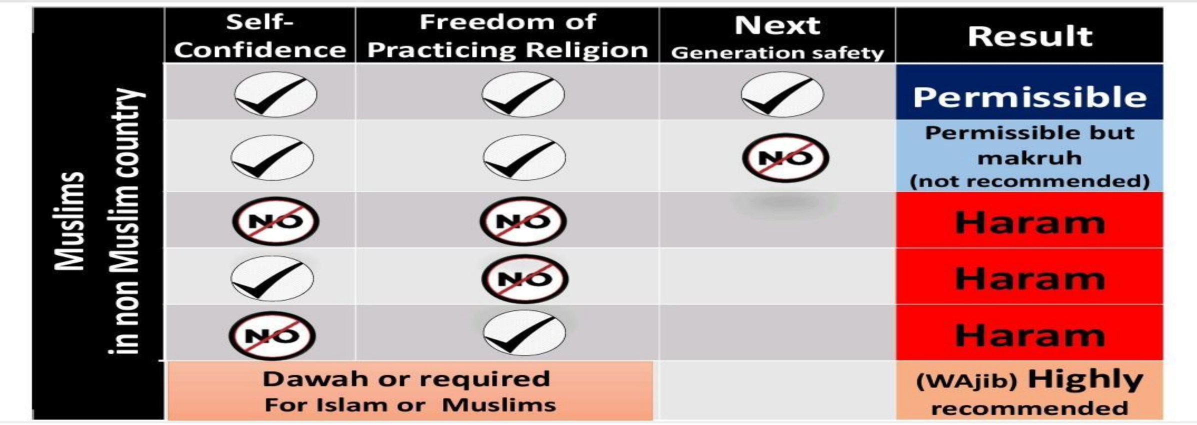

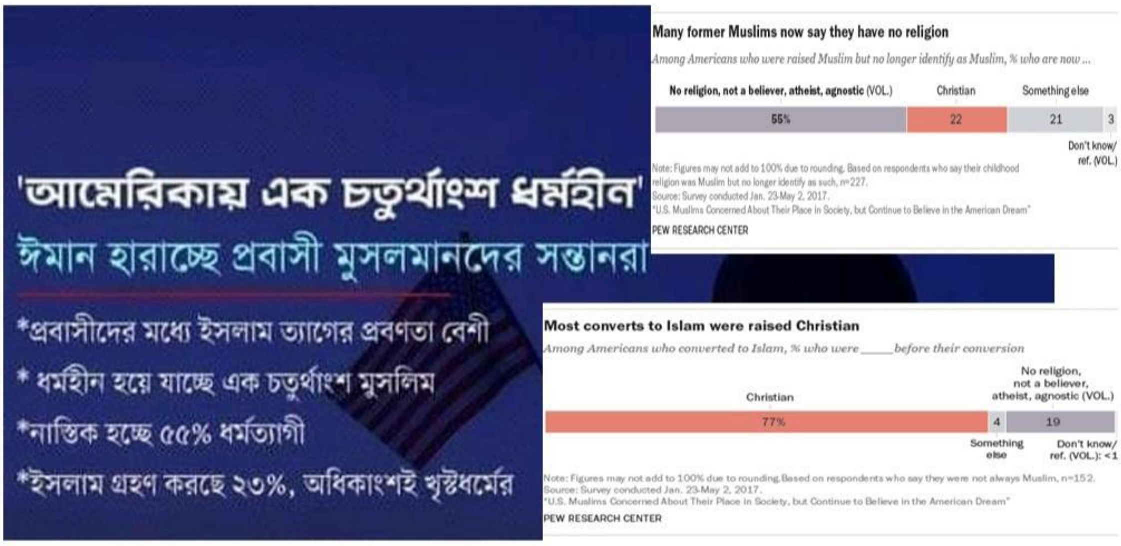

উপরোক্ত তথ্যাদি থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, বর্তমানে মুসলিমরা যারা অমুসলিম দেশে যাচ্ছেন তারা মুসলিম থাকলেও তাদের সন্তানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমান ইমান ও ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন, এমনকি ইসলাম ত্যাগ করছেন।যা একজন মুসলিম হিসেবে মোটেই কাম্য নয়।এবং তাদের এই মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের জন্য অমুসলিম দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, সংস্কৃতি অনেকাংশে দায়ী। তারা

নিজেদের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে হতাশ,কারন ইসলামের পূর্নাঙ্গ চিত্র তাদের কাছে তুলে ধরা হয়নি,এর ফলে তারা খুব সহজেই বিজাতীয় সংস্কৃতিতে আকৃষ্ট হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে তারা দ্বীন ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইসলাম ত্যাগ করছে।

এজন্য যদি অমুসলিম দেশে যাওয়া বা স্থায়ীভাবে বসবাসের শর্তগুলো প্রতি ভুক্ষেপ না করে সেখানে স্থায়ী ভাবে বসবাস জায়েজ হবে না।

অমুসলিম দেশে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

প্রয়োজন ছাড়াই কেউ অমুসলিমদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে ও অন্যান্য সম্পর্ক রাখতে তাদের দেশে চলে গেলে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের হয়ে কোনো কাজে অংশ নিলে তার জন্য অমুসলিম দেশে বসবাস হারাম ও নাজায়িজ।" এ সম্বন্ধে কুরআনুল কারিমে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আল্লাহ বলেন:

يَا يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ

ۚبَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم) হে ইমানদারগণ, ইয়াহুদি-খ্রিষ্টানদের তোমরা বন্ধু বানিয়ো না। তারা নিজেরা একে অন্যের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদেরকে বন্ধু বানাবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে

আল্লাহর পথে দাওয়াতের জন্য সফর

যদি অমুসলিম দেশে সফর বা সেখানে বসবাস আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে হয় তাহলে তা জায়িজ, বরং মুসতাহাব। পৃথিবীতে ইসলাম এভাবেই বিস্তার লাভ করেছে। মহান ব্যক্তিরা এভাবেই নিজেদের দেশ ছেড়ে অমুসলিম দেশে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেছেন এবং নিজেদের কথা, কাজ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে ইসলামের বাণী পৃথিবীর আনাচে-কানাচে পৌঁছে দিয়েছেন। পৃথিবীর সকল জাতির কাছে দাওয়াত পৌঁছানো এই উম্মাহর ওপর ফরজে কিফায়া। আল্লাহ বলেন:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون(

মুমিনদের সবার একসঙ্গে অভিযানে বেরোনো ঠিক নয়। তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটি অংশ কেন বেরোয় না, যাতে তারা দীন সম্পর্কে জ্ঞানের অনুশীলন করতে পারে এবং ফিরে আসার পর তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা (অসদাচরণ) থেকে বিরত হয়? [সুরা তাওবা: ১২২)

জ্ঞান অর্জনের জন্য সফর

আর অমুসলিম দেশে জ্ঞান অর্জনের জন্য সফর করা বিশেষ কিছু শর্ত পূর্ণ না হলে জায়েয হবে না।

১/ব্যক্তির কাছে এমন ইল্‌ম থাকা চায় যে ইল্‌ম দিয়ে সে ব্যক্তি সংশয়গুলোকে প্রতিহত করতে পারবে। কেননা অমুসলিম দেশগুলোতে তারা মুসলিম ছেলেদের কাছে নানারকম সংশয় উপস্থাপন করে, যাতে করে তাদেরকে তাদের ধর্ম থেকে সরিয়ে নিতে পারে।
২/ব্যক্তি নিজেকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বাঁচিয়ে/রাখতে সক্ষম এমন দ্বীনদারি থাকা। দুর্বল দ্বীনদারি নিয়ে সেখানে যাবে না। গেলে সে ব্যক্তি কুপ্রবৃত্তির কাছে হেরে গিয়ে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হবে।
৩/ বিদেশে গিয়ে পড়ার প্রয়োজন সাব্যস্ত হওয়া; যদি এই সাবজেক্ট মুসলিম দেশে না থাকে।

যদি এই শর্তগুলো পরিপূর্ণ থাকে তাহলে সে ছাত্র বিদেশে যাক। যদি এগুলোর কোন একটি অনুপস্থিত থাকে তাহলে সে ব্যক্তির বিদেশে সফর করা অনুচিত। কারণ দ্বীনদারি রক্ষা করা অন্য যে কোন কিছু রক্ষা করার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
এই মাসয়ালার বিস্তারিত খুঁটিনাটি দেখুন শাইখ উছাইমীনের ফতোয়াসমগ্র (৩/২৮)

ব্যাবসার জন্য সফর

বানিজ্যের উদ্দেশ্যেও কাফেরদের রাষ্ট্রে গমণ করে, তাহলে তার জন্য সেখানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় অবস্থান করা মাকরূহ।'হযরত মাকহুল (রাযি.) থেকে সুনানে আবু দাউদের মারাসিলে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম ইরশাদ করেছেন :
لا تتركوا الذرية ازاء العدو.
'নিজের সন্তানদের মুশরিকদের মধ্যে বিচরণ করতে দেবে না।
এ কারণেই ফুকাহায়ে কেরাম অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, কেবলমাত্র চাকরি করার উদ্দেশ্যে কোন মুসলমানের অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করা এবং তাদের জনসংখ্যা বর্ধিত করার কারণ হওয়া এমন একটি (ধিকৃত) কাজ, যার দ্বারা তার বিশ্বস্ততা ক্ষুণ্ণ হয়ে যায় ।

(মাআলিমুস সুনান লিল-খাত্তাবী : [আবু সুলায়মান আল খাত্তাবী, মৃত্যু : ৩৮৮ হি.] খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৩৭)

কখনো কখনো ব্যাবসার উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশে যাওয়া বা বসবাসের প্রয়োজন দেখ দেয়। তার কয়েকটি ধরন হতে পারে:

১. নিজের দেশে উপার্জনের ব্যবস্থা না থাকায় কোনো মুসলিম বাধ্য হয়ে অমুসলিম দেশে গিয়ে বাস করতে শুরু করলে, অধিকাংশ আলিমের মতে তা জায়িজ

২.নিজের দেশে মৌলিক চাহিদা পূরণ করা গেলেও পরিবারের আর্থিক উন্নতির জন্য কোনো অমুসলিম দেশে যাওয়ার দরকার পড়লে, যাওয়ার সুযোগ রয়েছে।" কুরআনুল কারিমে আল্লাহ বলেন:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُم(ۚ

'তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণে কোনো পাপ নেই।' [সুরা বাকারা: ১৯৮)

ব্যাবসার উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশে বসবাস অধিকাংশ ফকিহের মতে জায়িজ।
৩.অমুসলিম দেশে লোকে এজন্য বসবাস করে যে,তাদের বিষয়
চাহিদার পূর্ণতা সেখানে তারা পেয়ে থাকে। যেমন কেউ যদি কোনো মুসলিম দেশ থেকে বিশেষ কাজের জন্য অমুসলিম কোনো দেশে যায়, অথবা সাংবাদিক হিসেবে যদি সেখানে গিয়ে তাকে বসবাস করতে হয়, তাহলে তার জন্য তা জায়িজ আছে।

এ অবস্থায় নিচের বিষয়গুলো অবশ্যই লক্ষণীয়:

১. এ কাজে কোনো না কোনো উপকার থাকতে হবে। এর দ্বারা সাধারণ মুসলিমদের কোনো ক্ষতি যেন না হয়।

২. শরিয়তবিরোধী কোনো কাজ যেন না হয়। সেই সঙ্গে কাজের পদ্ধতি ইসলামের বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক যেন না হয়।

৩. দেশ এমন হতে হবে যে, ধর্মীয় নিদর্শনাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও ধর্মীয় বিধানাবলির ওপর আমল করতে পূর্ণ স্বাধীনতা সেখানে যেন থাকে। একইসঙ্গে রাজনৈতিক বা সামাজিকভাবে কোনো প্রকারের বাধাও থাকতে পারবে না।"

চিকিৎসার জন্য সফর

কেউ অসুস্থ হলে এবং মুসলিম দেশে উপযুক্ত চিকিৎসা না পেলে অমুসলিম দেশে অবস্থান করে চিকিৎসা নিতে পারবে

পর্যটনের জন্য সফর

বর্তমানে ভ্রমনপিপাসু মুসলিমদের প্রায়ই অমুসলিম দেশে ভ্রমন করে থাকেন।অধিকাংশই এর শারঈ নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে অবগত নন আবার অনেকেই এভাবে ব্যাখ্যা করেন যে,

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআন বলেছেন,

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন। অতঃপর আল্লাহ পুর্নবার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। (সূরা আনকাবুত-২০)

তারা এই আয়াতের অপব্যাখ্যা করে বলেন যে "আল্লাহই ত নির্দেশ দিয়েছেন ভ্রমন করার,আর এক্ষেত্রে তারা কৌশলে মুফতিয়ে কেরামদের ফতোয়া এড়িয়ে যান।

তিনটি শর্ত সাপেক্ষে অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করা বৈধ:

১. ভ্রমণকারীর কাছে প্রয়োজনীয় ইলম বিদ্যমান থাকা, যার মাধ্যমে সকল সন্দেহ থেকে বিরত থাকা সম্ভব।
২. তার কাছে এমন দীনদারী বিদ্যমান থাকা, যার মাধ্যমে সে নফসের প্রবৃত্তি দমনে সক্ষম হবে।
৩. অমুসলিম দেশে ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান থাকা।

উপরের শর্তগুলো পাওয়া না গেলে অমুসলিম দেশে সফর করা বৈধ নয়। কেননা এতে ফিতনার ভয় রয়েছে। এতে প্রচুর সম্পদও বিনষ্ট হয়ে থাকে।

বিজ্ঞ আলেমদের ময় অনুযায়ী, "পর্যটনের উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করার কোনো দরকার নেই; বরং এমন ইসলামী দেশে যাওয়া যায় যেখানে ইসলামের বিধিবিধান পালন করা হয়। আমাদের ইসলামী দেশসমূহে যথেষ্ট পর্যটনের স্থান রয়েছে। সেখানে পর্যটনের জন্য যাওয়া এবং সেখানে গিয়ে ছুটি কাটানো সম্ভব এবং এটিই করা উচিৎ।

অমুসলিম দেশে দাওয়াতের জন্য সফর

যদি অমুসলিম দেশে সফর বা সেখানে বসবাস আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে হয় তাহলে তা জায়িজ, বরং মুসতাহাব। পৃথিবীতে ইসলাম এভাবেই বিস্তার লাভ করেছে। মহান ব্যক্তিরা এভাবেই নিজেদের দেশ ছেড়ে অমুসলিম দেশে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেছেন এবং নিজেদের কথা, কাজ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে ইসলামের বাণী পৃথিবীর আনাচে-কানাচে পৌঁছে দিয়েছেন। পৃথিবীর সকল জাতির কাছে দাওয়াত পৌঁছানো এই উম্মাহর ওপর ফরজে কিফায়া। আল্লাহ বলেন:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ

لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون) মুমিনদের সবার একসঙ্গে অভিযানে বেরোনো ঠিক নয়। তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটি অংশ কেন বেরোয় না, যাতে তারা দীন সম্পর্কে জ্ঞানের অনুশীলন করতে পারে এবং ফিরে আসার পর তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা থেকে বিরত হয়? (সুরা তাওবা: ১২২)

অমুসলিমদের সাথে আচরণে ইসলামের নির্দেশনা

সাহাবী হযরত জাবের রা. বর্ণনা করেন, একদিন আমাদের পাশ দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর দেখাদেখি আমরাও দাঁড়ালাম। আমরা তাঁকে বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ তো এক ইহুদির লাশ!' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যখন কোনো লাশ নিতে দেখবে, তখন দাঁড়াবে।' -সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৩১১

আরেক হাদীসে এসেছে, হযরত সাহল ইবনে হুনাইফ ও হযরত কায়েস ইবনে সাদ রা. একদিন বসা ছিলেন। তারা তখন কাদিসিয়ায় থাকেন। পাশ দিয়ে একটি লাশ নেয়া হচ্ছিল। তা দেখে তারা দুজনই দাঁড়ালেন। উপস্থিত লোকেরা তাদেরকে জানাল, 'এ এক অমুসলিমের লাশ।' তাঁরা তখন শোনালেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়েও একবার এক লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি যখন তা দেখে দাঁড়ালেন, উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম তখন বললেন, এ তো ইহুদির লাশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, أليست نفسا অর্থাৎ 'সে মানুষ ছিল তো?' -সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৩১২

অমুসলিমদের সাথে আচরণে ভদ্রতা ও সৌজন্য রক্ষা করার জন্যে ইসলাম যে উদার নির্দেশনা দেয়, উপরোক্ত হাদীসটিই তার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট।[1]

সমাজবদ্ধভাবে জীবনযাপন করতে গিয়ে নানা শ্রেণির নানা পেশার নানা মত ও পথের মানুষের মুখোমুখি হতে হয়। মুখোমুখি হতে হয় অমুসলিমদেরও। লেনদেন ওঠাবসা চলাফেরা সাহায্য-সহযোগিতা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে একজন মুসলমান ও একজন অমুসলমানের সাক্ষাৎ হতে পারে। কোনো মুসলিমপ্রধান দেশে অমুসলিমদের বসবাস কিংবা কোনো অমুসলিমপ্রধান দেশে মুসলমানদের বসবাস এখন বিচিত্র কিছু নয়। অমুসলিম ব্যক্তি হতে পারে কোনো মুসলমানের প্রতিবেশী। কোনো অমুসলিম যদি পুরনো ধর্ম ছেড়ে ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়, তাহলে তো আরও অনেক অমুসলিমের সাথে তার আত্মীয়তার সম্পর্কও থাকবে। বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে যেভাবে দলে দলে অমুসলিম ইসলামের ছায়াতলে আসছে, তাতে এ বিষয়টি খুবই প্রাসঙ্গিক।

ইসলামে অমুসলিমদের বিরম্নদ্ধে যুদ্ধের বিধানও দেয়া হয়েছে- এ কথা ঠিক, তবে এও অনস্বীকার্য যে, যুদ্ধের ময়দানের বাইরে তাদের নিরাপত্তাদান, তাদের সাথে সৌজন্য বজায় রেখে উত্তম আচরণের কথাও বলা হয়েছে। এমনকি যুদ্ধের মাঠেও যেন অমানবিক আচরণ করা না হয়, যারা যুদ্ধে অংশ নেয়নি তাদেরকে, বিশেষত নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের ওপর যেন হামলা করা না হয়- এ আদেশও দেয়া হয়েছে।

যদি কারও কোনো প্রতিবেশী কিংবা কোনো আত্মীয় অমুসলিম হয়, ইসলামের নির্দেশনা হল- তার সাথেও প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের হক রক্ষা করে চলতে হবে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এ দুটি সম্পর্ক রক্ষা করার ওপর যথেষ্ট জোর দেয়া হয়েছে।

সাহাবী হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, একজন প্রতিবেশীর ওপর আরেকজন প্রতিবেশীর কী হক রয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন,

إِنِ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ وَإِنِ اسْتَعَانَكَ أَعَنْتَهُ وَإِنْ مَرِضَ عُدْتَهُ وَإِنِ احْتَاجَ أَعْطَيْتَهُ وَإِنِ افْتَقَرَ عُدْتَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّيْتَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ وَإِذَا مَاتَ اتَّبَعتَ جَنَازَتَهُ وَلَا تَسْتَطِيلُ عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ فَتَحْجُبَ عَنْهُ الرِّيحَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تُؤْذِيهِ بِرِيحِ قِدْرِكَ إِلَّا أَنْ تَغْرِفَ لَهُ وَإِنِ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَأَهْدِ لَهُ ...

‘যদি সে তোমার কাছে ঋণ চায় তাহলে ঋণ দেবে, যদি তোমার সহযোগিতা চায় তাহলে তাকে সহযোগিতা করবে, যদি সে অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে তার খোঁজখবর নেবে, তার কোনোকিছুর প্রয়োজন হলে তাকে তা দেবে, সে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়লে তার খোঁজখবর নেবে, যখন সে ভালো কিছু লাভ করবে তখন তাকে শুভেচ্ছা জানাবে, যদি সে বিপদে পড়ে তাহলে সান্ত্বনা দেবে, মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় শরিক হবে, তার অনুমতি ছাড়া তোমার ঘর এত উঁচু করবে না যে তার ঘরে বাতাস ঢুকতে পারে না, কোনো ভালো খাবার রান্না করলে তাকে এর ঘ্রাণ ছড়িয়ে কষ্ট দেবে না, তবে যদি তার ঘরেও সে খাবার থেকে কিছু পৌঁছে দাও। যখন কোনো ফল কিনে তোমার বাড়িতে নেবে তখন হাদিয়াস্বরূপ তাকে সেখান থেকে কিছু দেবে। [খারায়েতী, তবারানী, আবুশ শায়খ- ফাতহুল বারী[2], খ. ১০, পৃ. ৫১৯, কিতাবুল আদব, বাব-৩১]

আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার বিষয়ে নির্দেশনা তো আরও স্পষ্ট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে আল্লাহ ও পরকালে ঈমান এনেছে সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে। -সহীহ বুখারী, হাদীস : ৬১৩৮

প্রতিবেশী ও আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলার এই যে নির্দেশনা, তাতে মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। এমনটি বলা হয়নি- তোমার প্রতিবেশী কিংবা আত্মীয় যদি মুসলমান হয়, ধার্মিক হয়, ভালো মানুষ হয়, তাহলে তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে। বরং প্রতিবেশী ও আত্মীয় যেমনই হোক, মুসলমান হোক কিংবা না হোক, তার অধিকার অকাট্য ও অনস্বীকার্য। একজন মুসলমানকে এ অধিকার রক্ষা করেই জীবনযাপন করতে হবে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের কিছু নির্দেশনা এমনও রয়েছে, যেখানে সুস্পষ্ট ভাষায় অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও সম্পর্ক রক্ষা করতে বলা হয়েছে। যেমন, সূরা আনকাবুতের ভাষ্য-

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

আমি মানুষকে বাবা-মায়ের সাথে সুন্দর আচরণের আদেশ করেছি। তবে তারা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে আমার সঙ্গে এমন কিছু শরিক করতে, যে সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তাহলে তাদের কথা মানবে না। -সূরা আনকাবুত, আয়াত : ৮

সূরা লুকমানে একই প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে,

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

তারা যদি এমন কাউকে (প্রভুত্বে) আমার সমকক্ষ সাব্যস্ত করার জন্য তোমাকে চাপ দেয়, যে সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তাদের কথা মানবে না। তবে দুনিয়ায় তাদের সাথে সদাচরণ কর। এমন ব্যক্তির পথ অবলম্বন কর, যে একান্তভাবে আমার অভিমুখী হয়েছে। অতপর তোমাদের সকলকে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে অবহিত করব তোমরা যা-কিছু করতে। -লুকমান, আয়াত : ১৫

কুরআনে কারীমের উক্ত আয়াত দুটি থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, যদি কোনো মুশরিক বাবা-মা তাদের মুসলিম কোনো সমন্তানকে ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ তাআলার সাথে শিরক করতে বলে, তাহলে তাদের এ আদেশ কখনো মানা যাবে না। কিন্তু এমতাবস্থায়ও তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করতে হবে। বাবা-মায়ের হক আদায় করতে হবে।

প্রতিবেশীর অধিকার সম্বলিত যেসকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেসবে মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি- সাহাবায়ে কেরামের জীবনী থেকেও এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.-এর ঘটনা। একদিন তার ঘরে একটি বকরি জবাই করা হল। খাবার রান্না হলে তিনি তার গোলামকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের ইহুদি প্রতিবেশীকে কি এ খাবার দিয়েছ?' এরপর তিনি বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, প্রতিবেশীর বিষয়ে জিবরাইল আমাকে এত উপদেশ দিচ্ছিলেন, আমি মনে করছিলাম, তিনি হয়ত তাদেরকে ওয়ারিশই বানিয়ে দেবেন।' -জামে তিরমিযী, হাদীস : ১৯৪৩

ইসলামী রাষ্ট্রে যে সকল অমুসলিম রাষ্ট্রীয় নিয়মকানুন মেনে বসবাস করবে, তারা সেখানে পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে নিরাপদ জীবন যাপন করবে। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তারা তাদের নির্ধারিত সকল হক পাবে। সন্দেহ নেই, রাষ্ট্রের শান্তিশৃংখলা বজায় রাখার জন্যে এ বিধানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

হযরত উমর রা.-এর একটি ঘটনা। তিনি তখন খলীফাতুল মুসলিমীন। একদিন এক ইহুদি বৃদ্ধকে দেখলেন মসজিদের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়াতে। তখন তিনি ইহুদিকে লক্ষ করে বললেন,

مَا أَنْصَفْنَاكَ إِنْ كُنَّا أَخَذْنَا مِنْكَ الْجِزْيَةَ فِي شَبِيبَتِكَ، ثُمَّ ضَيَّعْنَاكَ فِي كِبَرِكَ. قَالَ: ثُمَّ أَجْرَى عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَا يُصْلِحُهُ

আমরা তোমার ওপর ইনসাফ করতে পারিনি যদি তোমার যৌবনে আমরা তোমার নিকট থেকে জিয্য়া গ্রহণ করে থাকি আর তোমার বার্ধক্যে তোমাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেই। এরপর তিনি তার জন্যে বায়তুল মাল থেকে প্রয়োজনীয় ভাতার ব্যবস্থা করে দেন। -কিতাবুল আমওয়াল, ইবনে যানজূয়াহ্, ১/১৪৩, হাদীস ১৭৯

হযরত উমর রা. বৃদ্ধ ইহুদির জন্যে রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকে ভাতার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন- এটা তো তিনি শাসক হিসেবে করতেই পারেন। কিন্তু তিনি সেই ইহুদিকে লক্ষ করে যে কথাটি বললেন, তা আমাদের সামনে চিন্তার নতুন দুয়ার খুলে দিতে পারে। যে সহানুভূতি তিনি প্রকাশ করেছেন এটাই ইসলামের সৌন্দর্য ও আসল চরিত্র।

সাংস্কৃতিক সম্প্রতি ইসলামবিরোধী

কাফিরদের অনুকরণ, অনুসরণ ও তাদের সামঞ্জস্য বিধান করার বিষয়টি নিঃসন্দেহে মারাত্মক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়, যা ইসলাম সীমাহীন গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি তার আমানত যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, রিসালাতের দায়িত্ব পূর্ণভাবে আদায় করেছেন এবং উম্মতের কল্যাণ কামনা করেছেন, তিনি উম্মতকে বহু হাদীসে এবং বিভিন্ন সময় ও সুযোগে কাফিরদের অনুকরণ করার ব্যাপারে কখনও সার্বিকভাবে আবার কখনও কখনও সবিস্তারে সতর্ক করে দিয়েছেন। অথচ এ উম্মতের মধ্য থেকে কতিপয় দল ও গোষ্ঠী এ অনুসরণ-অনুকরণ করার কাজে জড়িত হয়ে পড়েছে, যদিও তাদের তাতে জড়িত হওয়ার পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন স্তরের। আবার সময়ে সময়ে এ কাজের ভয়াবহতাও ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের, তবে সম্ভবত আমার পক্ষ থেকে বাড়িয়ে বলা হবে না যদি এটা বলি যে, এ যুগের মুসলিমগণ যে হারে কাফিরদের অনুসরণ-অনুকরণ করছে, তা অতীতের যে কোনো সময়ে (উম্মত কর্তৃক কাফিরদের) অনুসরণ-অনুকরণ করার চেয়ে অত্যধিক ভয়ঙ্কর পর্যায়ের।

প্রথম সমস্যা হলো, প্রতিবেশী হওয়াটা পরস্পরের সাংস্কৃতিক ও চারিত্রিক জীবনে বিরাট প্রভাব ফেলে। অমুসলিমদের পথ ও প্রথা থেকে মুসলিমদের যথাসাধ্য দূরে থাকতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে। তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন ও অনুকরণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। ইবাদত ও চালচলনের সব ক্ষেত্রে এমন পথ দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে কোনো ধরনের অনৈসলামিক প্রভাব নেই। বহু হাদিসে ইসলামি জীবনধারাকে অনৈসলামিক সংস্কৃতি থেকে পবিত্র রাখার নির্দেশনা এসেছে।

শরী'আতের বক্তব্যসমূহ যথাযথ পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মাধ্যমে আমরা এসব শ্রেণির অধিকাংশ সম্পর্কে জানতে পারব, যদিও এর মাধ্যমে পূর্ণ জ্ঞান অর্জিত হবে না, বরং কাছাকাছি পর্যায়ের জ্ঞান অর্জিত হবে।

প্রথম শ্রেণি: সাধারণভাবে সকল কাফির

সুতরাং কোনো প্রকার বিশিষ্টকরণ ছাড়াই সাধারণভাবে সব ধরনের কাফিরদের অনুসরণ-অনুকরণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। এর ওপর ভিত্তি করে এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে, সকল মুশরিক, ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজক, সাবেয়ী (তারকা-নক্ষত্র পূজক), নাস্তিক এবং তাদের মতো অন্যান্য ব্যক্তিগণ। সুতরাং ইবাদাত, আচার-আচরণ ও পোষাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে যা কিছু কাফিরদের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত হয়, এমন প্রত্যেক বিষয় থেকে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর গায়ে হলুদ বর্ণ বিশিষ্ট কাপড় দেখতে পেলেন, তখন তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন:

«إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها».

"নিশ্চয় এগুলো কাফিরদের পোষাক-পরিচ্ছদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তুমি তা পরিধান করো না।"[1] এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, পোষাক-পরিচ্ছদ যখন কাফিরদের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত হবে, তখন মুসলিম ব্যক্তির জন্য তা পরিধান করা বৈধ হবে না।[2]

দ্বিতীয় শ্রেণি: মুশরিকগণ

উম্মু সালামা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল প্রতি রবিবার বিশেষভাবে রোজা রাখতেন এবং বলতেন:

إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ

এই দিনে মুশরিকদের ইদ, আমি তাদের বিরোধিতা করতে চাই

মুশরিকদের পূজা, উৎসব ও কর্মকাণ্ডসমূহ অনুকরণ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। যেমন, শিস দেওয়া ও হাততালি দেওয়া। অনুরূপভাবে দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার নিকট সৃষ্টির মাধ্যমে সুপারিশ প্রার্থনা করা এবং সৃষ্টিরাজিকে মাধ্যমরূপে ব্যবহার করা, কবরের নিকট মান্নত করা ও (পশু-পাখি) যবাই করা ইত্যাদি। তদ্রূপ মুশরিকদের যেসব কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে

নিষেধাজ্ঞা এসেছে তন্মধ্যে অন্যতম হলো: সূর্যাস্তের পূর্বে ‘আরাফাত’ এর ময়দান থেকে প্রত্যাবর্তন করা।

পূর্ববর্তী সালাফে সালেহীন মুশরিকদের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ও তাদের সকল কর্মকাণ্ডকে অপছন্দ করতেন, যেমনটি আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর ইবনিল ‘আস রাদিয়াল্লাহ ‘আনহুমা এবং অন্যান্য সাহাবীগণ বলেছেন:

«من بنى ببلاد المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت , حشر معهم يوم القيامة».

“যে ব্যক্তি মুশরিকদের দেশে গৃহ নির্মাণ করে, তাদের ‘নওরোজ’ (নববর্ষ) ও ‘মেহেরজান’ (জাতীয় দিবস) এর উৎসব পালন করে এবং এ অবস্থায় মারা যায়, কিয়ামতের দিনে তাদের সাথে তার হাশর হবে”।[3]

আর আবদুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা মসজিদের উপর বিশেষ কক্ষ বানানোকে অপছন্দ করতেন এবং বেশ কয়েকবার তিনি এ ব্যাপারে সরাসরি নিষেধ করেছেন। কারণ, তিনি এটাকে মুশরিকদের প্রতিমা সদৃশ মনে করতেন।[4]

তৃতীয় শ্রেণি: আহলে কিতাব

রাসুল উম্মতের সাংস্কৃতিক মিশ্রণের আশঙ্কা করে বলেছেন:

لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لاَ تَّبَعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ

তোমরা তোমাদের পূর্বসূরিদের অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করবে। এমনকি তারা যদি গুঁইসাপের গর্তে ঢোকে, তোমরাও তা-ই করবে। সাহাবিরা বললেন, আল্লাহর রাসুল, পূর্বসূরি বলতে কি ইয়াহুদি-নাসারা? তিনি বললেন, তাহলে আর কে!

আহলে কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ইয়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায়। আমাদেরকে এমন প্রত্যেক বিষয় থেকে নিষেধ করা হয়েছে, যা ইয়াহূদী ও নাসারা অথবা তাদের কোনো এক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য। তাদের ইবাদাত, আচার-আচরণ, পোষাক-পরিচ্ছদ ও উৎসবসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, কবরের উপর ঘর নির্মাণ করা, কবরকে মসজিদ বানানো, ছবি উত্তোলন করা, নারীদের দ্বারা ফেতনায় পতিত হওয়া, সাহরী না খাওয়া, শুভ্র চুলে রং না করা, ক্রুশ উত্তোলন করা এবং তাদের উৎসবসমূহ উদযাপন করা অথবা তাতে তাদের সাথে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি।

চতুর্থ শ্রেণি: অগ্নিপূজক

অগ্নিপূজকদের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্য থেকে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আগুনের দিকে ফিরে পূজা করা, অগ্নিপূজা করা, রাজা ও বাদশাহদেরকে পবিত্র বলে ঘোষণা করা, মাথার সামনের অংশ বাদ দিয়ে পিছনের অংশের চুল কর্তন করা, দাঁড়ি মুণ্ডন করা, মোচ লম্বা করা, শিস দেওয়া এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার করা।

পঞ্চম শ্রেণি: পারস্য ও রোমের অধিবাসী

জাবির রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল বলেন:

إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا

শীঘ্রই তোমরা রোম ও পারস্যের মতো কর্মকান্ড করতে আরম্ভ করবে।

তারা নিজেদের বাদশাহদের ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে, আর বাদশাহরা বসে থাকে- এমনটি করবে না।

এ শ্রেণিটি আহলে কিতাব, অগ্নিপূজক ও অন্যান্যদেরকে শামিল করে। ইবাদাত, আচার-আচরণ ও ধর্মীয় উৎসব উদযাপন করার ক্ষেত্রে পারস্য ও রোমবাসীর বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুকরণ করা থেকেও আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন, বয়স্ক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে মহৎ ও পবিত্র জ্ঞান করা। এমন সব পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদের অনুসরণ করা, যারা সে সব বিধিবিধান রচনা করে, যা আল্লাহ তা'আলা অনুমোদন করেন নি এবং দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও কঠোরতা প্রদর্শন করা।

ষষ্ঠ শ্রেণি: অনারব অমুসলিমগণ

আর এটা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার ওপর ভিত্তি করেই বলা হচ্ছে। কারণ হাদীসে এসেছে,

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ... أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِى أَسْفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الأَعَاجِمِ أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا مِثْلَ الأَعَاجِمِ».

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো পুরুষ ব্যক্তি কর্তৃক অনারবদের মতো তার পোষাকের নিচের অংশে রেশম ব্যবহার করতে অথবা কাঁধের উপরের অংশে অনারবদের মতো রেশম ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন”।

অনুরূপভাবে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজন কর্তৃক কোনো ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাঁড়াতেও নিষেধ করেছেন; বরং তিনি কোনো সমস্যার কারণে বসা অবস্থায় সালাত আদায়কারী ইমামের মুক্তাদিকে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন এ আশঙ্কায় যে, কেউ এ দাঁড়ানোটিকে ইমামের সম্মানার্থে বলে মনে করবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, উক্ত হাদীসে আগত এ নিষেধাজ্ঞার কারণ হচ্ছে, এটি অনারবদের কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়। কেননা, তারা তাদের নেতৃবৃন্দ ও বয়স্কজনদের নিকট কেবল দাঁড়িয়েই থাকত। বস্তুত এটা নিষিদ্ধ; কারণ তা অনারব কাফিরদের অনুকরণ-অনুসরন বৈ কিছু নয়

উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে সাব্যস্ত আছে যে, তিনি ভিনদেশী তথা অনারব ও মুশরিকগণের সাজসজ্জা গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন আর পূর্ববর্তী আলেমগণের অনেকেই অনুরূপ ইঙ্গিত করেছেন।

সপ্তম শ্রেণি: জাহেলিয়াত ও তার অনুসারীগণ

জাহেলিয়াতের সকল কর্মকাণ্ড, আচার-আচরণ, পূজাপার্বণ, স্বভাব-চরিত্র ও বিশেষ নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে ইসলামী শরী‘আতে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। যেমন, বেপর্দা হওয়া, নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করা, হজ ও উমরার ইহরামে প্রবেশ করার পর সূর্যের উত্তাপ থেকে ছায়া গ্রহণ না করা, অথবা এমন কাজ করা যাতে ছায়া গ্রহণ না করতে হয়। যেমনটি আজকের দিনের শিয়া-রাফেযীরা করে থাকে। কারণ, এগুলো জাহেলী যুগের ও মুশরিকগণের কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে লজ্জাস্থান বা তার অংশবিশেষ প্রকাশ করা, জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক পক্ষপাতিত্ব, বংশ মর্যাদা নিয়ে গর্ব করা, অন্য বংশের প্রতি কটাক্ষ করা, মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা এবং গ্রহ-নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা। কারণ, যখন ইসলাম আগমন করেছে, তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহেলিয়াতের সকল অবস্থা, রীতিনীতি, আচার-আচরণ, প্রথা বা ঐতিহ্য, নিয়ম-কানূন, যাবতীয় মেলা, সৌন্দর্য প্রদর্শন করা, নারী-পুরুষে মেলামেশা এবং সুদ প্রথাকে বাতিল ঘোষণা করেছেন।

অষ্টম শ্রেণি: শয়তান

যাদেরকে অনুসরণ করার ব্যাপারে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তন্মধ্যে অন্যতম হলো শয়তান। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়তানের কতিপয় কর্মকাণ্ডের কথা

উল্লেখ করেছেন এবং তার থেকে তিনি নিষেধ করেছেন; যেমন, বাম হাতে খাওয়া ও পান করা। ইমাম মুসলিম রহ. প্রমুখ বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لاَ يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلاَ يَشْرَبَنَّ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا».

"তোমাদের কেউ যেন কখনও বাম হাতে পানাহার না করে। কারণ, শয়তান তার বাম হাত দ্বারা খায় এবং পান করে"।[7]

অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, মুসলিমগণের অনেকেই খুব সহজেই অথবা হকের (সত্যের) প্রতি অহঙ্কার বশতঃ এবং কাফির ও ফাসিকগণের মধ্য থেকে শয়তানের বন্ধুদের অনুকর করত এ অভ্যাসে জড়িয়ে গেছে।

নবম শ্রেণি: বেদুইন বা যাযাবর শ্রেণি যাদের দীন পূর্ণ হয় নি

তারা হলো জাহিল বা মূর্খ বেদুইন। কারণ, বেদুইন বা যাযাবরগণ অনেক রীতি-নীতি ও ঐতিহ্যের জন্ম দিয়েছে, ইসলামের নিয়মনীতির সাথে যেগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই; তার কিছু এসেছে উত্তরাধিকার সূত্রে জাহেলিয়াত থেকে। অভদ্র বেদুইনগণ তাদের চালচলন, রীতি-নীতি, প্রথা ও পরিভাষার ক্ষেত্রে ছিল শরী'আত পরিপন্থী। এর দৃষ্টান্ত হলো: জাহেলিয়াতের পক্ষপাতিত্ব করা, বংশ মর্যাদা নিয়ে গর্ব করা, অন্য বংশের প্রতি কটাক্ষ করা, মাগরিবের সালাতকে 'ইশা' বলে নামকরণ করা, এশার সালাতকে 'আতামা' বলে নামকরণ করা, তালাকের মাধ্যমে শপথ করা, তালাককে কর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা; চাচার কন্যাকে (চাচাতো বোনকে) অন্যের জন্য হারাম করে দেওয়া; যাতে করে সে কন্যা তার চাচাতো ভাই ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করতে না পারে। ইত্যাদি আরও বিবিধ জাহেলী রীতি-নীতি।

অমুসলিম রাষ্ট্রে খাদ্য সংক্রান্ত বিধিনিষেধ

আল্লাহ তায়ালা বলেন

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ

আল্লাহ তা'য়ালা যেসব বস্তু তোমাদেরকে দিয়েছেন, তন্মধ্য থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী(সুরা মায়েদা-৮৮)

অমুসলিম দেশে খাবার খাওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা রয়েছে। বিশেষ করে মুসলমানদের জন্য যেসব খাবার হালাল বা হারাম, তা নিয়েও বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। কিছু বিষয় যা মাথায় রাখা উচিত:

১. হালাল ও হারাম খাবার: ইসলামে নির্দিষ্ট কিছু খাবার হারাম হিসেবে বিবেচিত, যেমন শূকর, মৃতপ্রাণী, মদ, এবং যেসব প্রাণী আল্লাহর নাম নিয়ে জবেহ করা হয়নি তাদের মাংস। অমুসলিম দেশে খাওয়ার সময় এসব বিষয় খেয়াল রাখতে হবে।

২.বিশ্বাস ও সতর্কতা: মুসলমানরা যদি অমুসলিম দেশে খাবার খান, তবে তাদের জন্য সবসময় হালাল খাবারের খোঁজ করা উচিত। অনেক দেশেই হালাল রেস্তোরাঁ বা দোকান পাওয়া যায়। খাদ্য উপাদানগুলোর মধ্যে অ্যালকোহল বা অন্যান্য হারাম উপাদান আছে কিনা, তা যাচাই করা প্রয়োজন।

৩ অন্যান্য পরিবেশনা: কিছু দেশে খাবারের প্রস্তুত প্রণালী ও পরিবেশনায় ইসলামী নিয়ম অনুসরণ করা না হতে পারে, তাই যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

শরী'আতসম্মত জবেহের কিছু শর্ত

১.জবেহের সময় জবেহকারীর জন্য আল্লাহ তা'আলার নাম নেয়া আবশ্যক । কেননা কুরআন হাদীসে আল্লাহ জবেহকৃত প্রাণী। হালাল হওয়ার অন্যতম শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

যেসব জন্তুর উপর জবেহের সময়) আল্লাহর নাম নেয়া হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না। এ ভক্ষণ করা গুনাহ।" (সূরা আনআম: ১২১)

২.শরী'আত সম্মত জবেহের আরেকটি শর্ত হলো, জবেহকারী মুসলমান বা আহলে কিতাব হওয়া, সে জিম্মী হোক বা হারবী।

মুরগি জবেহের আধুনিক পদ্ধতি

কানাডা দক্ষিন আফ্রিকা, জাজিরাসহ বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত রাষ্ট্রে মুরগি জবেহ থেকে শুরু করে প্যাকেট জাত করা পর্যন্ত সব কাজই অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে সম্পন্ন করা হয়।

মেশিনের একদিকে জীবিত মুরগি দিলে অপরদিকে প্যাকেট হয়ে বেরিয়ে আসে। মুরগি জবেহ, দেহ থেকে চামড়া অপসারণ, পেটের ভেতর থেকে নাড়ি-ভুঁড়ি বের করা, গোশত পরিষ্কার হয়ে প্যাকেট হওয়া ইত্যাদি সবগুলো পর্যায়ই একটি বৈদ্যুতিক অটো মেশিনের সাহায্যে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

মেশিনে জবেহের দূষনীয় বিষয়াবলী

১. মেশিনে সংযোজিত ছুরিগুলো মুরগির গলার রগগুলো কাটার জন্য যথেষ্ট হলেও কোনো কোনো সময় যে কোনো কারণে। হুকে টানানো মুরগিগুলোর গলা অকর্তিত থেকে যায়। কিংবা

অল্প কেটে বেশি অংশ অকর্তিত থেকে যায়। আর এই দুই অবস্থায় শরী'আত সম্মত জবেহ হয় না।

২. মেশিনে ছুরিগুলো সংযোজিত থাকলে প্রতিটি মুরগির জন্যে বিসমিল্লাহ পড়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। কারণ জবেহকারী নির্ধারণ করা আবশ্যক। যেহেতু বিসমিল্লাহ পড়া জবেহকারীর উপর ওয়াজিব। সুতরাং যদি জবেহকারী ব্যতীত অন্য কেউ বিসমিল্লাহ পড়ে এবং জবেহকারী ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেয় তাহলে ঐ পশু খাওয়া হালাল হবে না। যদি মেনেও নেয়া হয়, যে ব্যক্তি মেশিন চালু করে সেই জবেহকারী। তবুও প্রতিটি মুরগী হালাল না হওয়ার আশংকা বিদ্যমান, যেহেতু তার পক্ষে প্রতিটি মুরগির জন্যে বিসমিল্লাহ পড়া সম্ভব নয়।

৩ মেশিনে জবেহ করলে মুরগির মাথা দেহ থেকে আলাদা হয়ে যায়, এটি মাকরূহ। আল্লামা আলী আল মারগীনানী রাহ. বলেন-

ومن بلغ بالسكين أو عا النخ قطع الرأس، له كره ذلك، كلو وت ذبيحته. জবেহে গর্দানের শেষ হাড্ডি পর্যন্ত কাটা বা মাথাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা মাকরূহ। তবে তার গোশত খাওয়া যাবে।" (হেদায়া:
৪/৪৩৮, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ)

৫. গরম পানির ভেতর মুরগির অতিবাহিত হওয়ার ক্ষেত্রে দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, যেসব মুরগির গলা ঘূর্ণায়মান ছুরির দ্বারা একেবারেই কাটে নি, বা অল্প কেটেছে এবং তার ভেতর প্রাণ অবশিষ্ট রয়েছে, গরম পানির ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হওয়ার।

কারণে সেগুলোর মৃত্যু ঘটার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

খ. মুরগিগুলো নাড়িভুঁড়ি বের করার পূর্বেই গরম পানির ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হয়ে থাকে। যদি পানি উত্তপ্ত গরম হয় এবং এতটুকু সময় পানিতে থাকে যে, নাপাকি গোশতের ভেতর প্রবিষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ঐ গোশত খাওয়া হালাল হবে না।

শরয়ী হুকুম:

উল্লিখিত সমস্যাগুলোর আলোকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে পশু জবেহ করা জায়েয নেই। কেননা আধুনিক মেশিনের সাহায্যে পশু জবেহ করলে তা হারাম

হওয়ার সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয় না। আর রাসূলুল্লাহ সাঃ একাধিক হাদীসে সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত আদী ইবনে হাতিম রাযি. বর্ণনা করেন-

قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي، وأجد معه كلبا آخر، لا أدري أيهما أخذه، فقال لا تأكل، فإنما سميت يعل

كلبك ولم تسم يعل . غيره

"আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাঃ! শিকারের উদ্দেশ্যে পাঠানো (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) কুকুরের সঙ্গে। অন্য কুকুরও দেখতে পাই এবং জানতে পারি না, কোনো কুকুর শিকার করেছে? রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, এরকম শিকার খেয়ো না। কেননা তুমি তোমার কুকুরের উপর বিসমিল্লাহ পড়েছ; অন্যটির উপর নয়।" (সহীহ বুখারী: হাদীস নং ৫৪৮৬

আধুনিক মেশিনের সাহায্যে পশু জবেহের জটিলতা নিরসন

উপরোল্লিখিত দূষণীয় বিষয়গুলোর ধারাবাহিক সংশোধন- ১. ঠান্ডা পানিতে বিদ্যুৎ সংযোগ না দেয়া। কিংবা কোনো প্রক্রিয়ায় এই বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যে, জবেহের আগেই বিদ্যুতের স্পর্শে মুরগির মৃত্যু হয়নি।

২. মেশিন থেকে ছুরি খুলে তার পরিবর্তে কয়েকজন মুসলমান দাঁড় করিয়ে দেবে। যখন মুরগিগুলো দাঁড়ানো লোকদের কাছ

দিয়ে অতিক্রম করবে তখন তারা পর্যায়ক্রমে প্রতিটি মুরগি বিসমিল্লাহ পড়ে জবেহ করবে। তদ্রূপভাবে যদি এমন কোনো মেশিন তৈরি করা যায়, যার সংযুক্ত ছুরিগুলো একজন মুসলমান নিয়ন্ত্রণ করবে এবং সে প্রতিবার বিসমিল্লাহ বলে সুইচ দিবে। এভাবে যে বার বিসমিল্লাহ বলে সুইচ দিবে সে বারে যে মুরগিগুলো জবেহ হবে সেগুলোর উপর বিসমিল্লাহ বলার কারণে এই জবেহ শরয়ী জবেহ হবে।

৩. এই বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া জরুরী যে, গরম পানির ভেতর যে মুরগি অতিবাহিত হয়, তা যেন ফুটন্ত পানির ভেতর এতক্ষণ সময় না থাকে যা দ্বারা অভ্যন্তরের নাপাকি গোশতের ভেতর প্রবিষ্ট হয়। উপরোক্ত সংশোধনী গ্রহণের পর মেশিনে জবাইকৃত মুরগিগুলো হালাল হয়ে যাবে।

অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মুসলিম কসাইয়ের সেবা নেওয়া

অমুসলিমরা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যদি মুসলিম কসাই দিয়ে প্রাণী জবাই করাতে চার, তবে প্রাণীটিকে মূর্তির নামে জবাই করা বা মূর্তির সামনে রাখা চলবে না। মূর্তি থেকে দূরে আলাদা স্থানে জবাইয়ের ব্যবস্থা করা হলে মুসলিম কসাই চাইলে জবাই করতে পারবে, পারিশ্রমিকও নিতে পারবে। ফাতওয়ায়ে আলমগিরিতে রয়েছে:

إِذَا اسْتَأْجَرَ طَبْلًا لَيْسَ بِلَهْوٍ وَذَكَرَ مُدَّةً يَجُوزُ وَرَجُلًا يَحْمِلُ الْجِيفَةَ أَوْ يَقْتُلُ مُرْتَدًّا أَوْ يَذْبَحُ شَاةً أَوْ ظَبْيًا يَجُوزُ

যদি কোনো অমুসলিম তবলা ভাড়া নেয় (যা খেলনার মাধ্যম নয়) এবং মেয়াদের আলোচনা করে, তাহলে এ লেনদেন জায়িজ। কারও কাছ থেকে কোনো মৃত জন্তু তুলে নিলে, ছাগল বা হরিণ জবাইয়ের চুক্তি করলে তা জায়িজ। ১৫২

এ মাসআলায় সরাসরি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কথা না থাকলেও 'মূর্তির সামনে জবাই' ও 'মূর্তির নামে জবাই' থেকে বোঝা যাচ্ছে অনুষ্ঠানটি ধর্মীয়ই। মূর্তির সামনে জবাইয়ের নির্দেশ থাকলে আমার মতে الخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ -এর অন্তর্ভুক্ত বলে এটা জঘন্য গুনাহ। কোনো পাপের কাজে সহায়তা করা জায়িজ নয়, বিশেষত বিধর্মীদের ধর্মীয় ক্ষেত্রে।

অমুসলিমদের সামাজিক অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা ও অংশগ্রহণ

এ ধরণের শুভেচ্ছা জায়েয হওয়ার জন্য আরও যেসব শর্ত পূর্ণ হতে হবে এখানে আমরা সে শর্তগুলো উল্লেখ করব:

১। শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা, কিংবা দেখতে যাওয়ার পরিবেশ যাবতীয় গর্হিত বিষয় থেকে মুক্ত হওয়া চাই; যেমন- নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, গান-বাজনা, হারাম খাবার-দাবার। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনুষ্ঠানাদিও নানারকম গর্হিত বিষয় থেকে মুক্ত থাকে না; অমুসলিমদের অনুষ্ঠানাদির অবস্থা তো আরও গুরুতর।

২। শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের ভাষা শরিয়ত-গর্হিত বিষয়াদি যেমন- শুরুতে সালাম, সম্মান ও স্থায়িত্বের দোয়া ইত্যাদি থেকে মুক্ত হওয়া।

অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা ও অংশগ্রহণ

শাইখ সালেহ আল উসাইমীন (রাহি) এর মতে, খ্রিস্টমাস (বড়দিন) কিংবা অন্যকোন বিধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে কাফেরদেরকে শুভেচ্ছা জানানো আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) তাঁর 'আহকামু আহলিয যিম্মাহ' নামক গ্রন্থে এ বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন: "কোন কুফরী আচারানুষ্ঠান উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানানো সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। যেমন- তাদের উৎসব ও উপবাস পালন উপলক্ষে বলা যে, 'তোমাদের উৎসব শুভ হোক' কিংবা 'তোমার উৎসব উপভোগ্য হোক' কিংবা এ জাতীয় অন্য কোন কথা। যদি এ শুভেচ্ছাজ্ঞাপন করা কুফরীর পর্যায়ে নাও পৌঁছে; তবে এটি হারামের অন্তর্ভুক্ত। এ শুভেচ্ছা ক্রুশকে সেজদা দেয়ার কারণে কাউকে অভিনন্দন জানানোর পর্যায়ভুক্ত। বরং আল্লাহর কাছে এটি আরও বেশি জঘন্য গুনাহ। এটি মদ্যপান, হত্যা ও যিনা ইত্যাদির মত অপরাধের জন্য কাউকে অভিনন্দন জানানোর চেয়ে মারাত্মক।যে ব্যক্তি কোন গুনার কাজ কিংবা বিদআত কিংবা কুফরী কর্মের প্রেক্ষিতে কাউকে অভিনন্দন জানায় সে নিজেকে আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির সম্মুখীন করে।"[

উপরের আলোচনা থেকে এটাও বোঝা যায় যে, অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান, পূজা- অর্চনা কিংবা উৎসব-পার্বণে শরিক হওয়া বা প্রতিনিধিত্ব করা মুসলিমদের জন্য নয়।

আমর ইবনু মুররা لا يشهدون الزوز-এর তাফসিরে লিখেছেন:

لَا يُمَاكِثُونَ أَهْلَ الشِّرْكِ عَلَى شِرْكِهِمْ وَلَا يُخَالِطُوْنَهُمْ

মুশরিকদের শিরকি কাজের প্রতি মনোযোগ দেওয়া যাবে না এবং তাদের
সঙ্গে কোথাও একত্রে থাকা যাবে না।

এসব বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়, গুনাহ ও কুফরির আসরে শরিক হওয়া বা নিজেকে হতে জড়ানো মানে আল্লাহর শাস্তিকে ডেকে আনা। এই সাধারণ নিষেধাজ্ঞায় অনমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাওয়াও অন্তর্ভুক্ত, কেননা তাতে অংশ নেওয়া গুনাহ। তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অধীনে যে বাজার বসে, তাও এর অন্তর্ভুক্ত। এজন্য প্রয়োজন ছাড়া তাদের বাজারে যাওয়াও মাকরুহ।

হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানবি রাহ-এর মতও এটাই। অধিকন্তু অনুসরণীয় যক্তিদের ক্ষেত্রে (এ পথ বন্ধ করার জন্য) এমন মেলামেশা থেকে বেঁচে থাকাকে তিনি ওয়াজিব বলে মত প্রকাশ করেছেন। **১৯১**

অমুসলিমদের উপহার আদান-প্রদানের বিধান

সাধারণভাবে সৎ উদ্দেশ্যে অমুসলিমদের উপহার আদান-প্রদান করা জায়িজ। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উত্তম। রাসুল থেকে এ ব্যাপারে উভয় ধরনের কর্মপন্থা বর্ণিত আছে। তিনি কয়েকজন অমুসলিমের উপহার গ্রহণ করেছেন, আবার কারও কারও উপহার ফিরিয়ে দিয়েছেন। যেমন:

১. পঞ্চম হিজরির কথা, তখনো মক্কাবাসী মুসলিমদের ওপর আক্রমণের জন্য নিজেদের অভিযানের সংবাদ পাঠায়নি। রাসুল তাদের মন জয় করতে আমর ইবনু উমাইয়া জামারিকে চিঠির সঙ্গে আজওয়া খেজুর দিয়ে আবু সুফিয়ানের কাছে পাঠান, নিজেও তার কাছ থেকে কিছু উপহার পেতে চান বলেজানান। ফলে আবু সুফিয়ানও কিছু জিনিস উপহার হিসেবে পাঠিয়ে দেন।
কোনো কোনো উপহার তিনি প্রত্যাখ্যানও করেছেন। যেমন:

১. আবু বারা আমির ইবনু মালিক ইবনু জাফর, যার উপাধি ছিল মূলাইবুল আসিয়া, রাসুল-এর কাছে উপহার হিসেবে একটি ঘোড়া পাঠায়। নবিজি এই বসে সেটা ফিরিয়ে দেন যে, إِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ-আমাকে মুশরিকদের উপহার গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

কোনো কোনো উপহার তিনি ফিরিয়ে দেননি, তবে নিজে ব্যবহার না করে অন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন।

ফকিহরা এসব বর্ণনাকে সামনে রেখে এ মাসআলা বর্ণনা করেছেন যে, অমুসলিমদের উপহার গ্রহণের ক্ষেত্রে কুফরির বিপরীতে যদি ইমানের মর্যাদাহানির শঙ্কা জাগে, তাহলে তার উপহার গ্রহণ করা যাবে না।১০

এ মাসআলাও এখান থেকে উদ্ধৃত যে, যদি অমুসলিমদের উপহার গ্রহণের উদ্দেশ্য হয় তাদের মন জয় করা এবং এর ফলে তাদের ইসলাম ও মুসলিমদের নিকটবর্তী হওয়ার আশা থাকলে উপহার গ্রহণ করা জায়িজ; অন্যথায় নয়।

অমুসলিমদের উপহার দেওয়া

১.হৃদ্যতা তৈরির জন্য ও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য কোন মুসলমানের পক্ষ থেকে কাফেরকে বা মুশরিককে উপহার দেয়া জায়েয। বিশেষতঃ যদি প্রতিবেশী হয় অথবা আত্মীয় হয়। উমর (রাঃ) মক্কায় বসবাসকারী তাঁর মুশরিক ভাইকে একটি হুল্লাহ (এক ধরনের পোশাক) উপহার দিয়েছিলেন।"[সহিহ বুখারি, ২৬১৯]
২.তবে কাফেরদের কোন উৎসবের দিন তাদেরকে উপহার দেয়া যাবে না। কেননা এটা এই বাতিল দিবসকে স্বীকৃতি দেয়া ও সেটা উদযাপনের পর্যায়ে পড়ে। আর তা যদি এমন হাদিয়া হয় যা দিবস উদযাপনের কাজে লাগে যেমন- খাবার বা মোমবাতি ইত্যাদি তাহলে সেটা আরও বেশি জঘন্য হারাম। কোন কোন আলেমের মতে- সেটা কুফরি।

পতাকার সম্মানে মাথা নোয়ানো

অমুসলিম দেশে এমন আরও কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যাকে অন্যান্য জাতি কেবল রাজনৈতিক এবং জাতীয় বিষয় মনে করে। কিন্তু মুসলিমদের জন্য এটা তাঁদের ধর্মীয় বিষয়।

বর্তমানে অধিকাংশ দেশে জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রচলন রয়েছে। এটা করার সময় কারও বসে থাকাকে বেআদবি বা রাষ্ট্রীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হয়।

এ বিষয়ে দেওবন্দি আলিমদের দুটি মত পাওয়া যায়:

১. ফুলওয়ারি শরিফ পাটনি থেকে প্রকাশিত মাসিক ম্যাগাজিন নকিবে মুফতি কিফায়াতুল্লাহ রাহ-এর একটি ফাতওয়া প্রকাশিত হয়। তাঁর ফাতওয়ার সারকথাটি এমন: 'পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন মুসলিম লিগও করে এবং অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রেও তা করা হয়। এটা একটা জাতীয় বিষয়, যাতে সংশোধনী আনা প্রয়োজন। কিন্তু একে ঢালাওভাবে মুশরিকদের কাজ বলা ঠিক হবে না। ১৯৫

সমকালীন কোনো কোনো আলিমও এই মতই গ্রহণ করেছেন। অবশ্য কেউ কেউ পতাকার সামনে সোজা দাঁড়িয়ে থাকাকে জায়িজ বলেছেন আর হাত জোড় করা বা মাথা নত করাকে বলেছেন নাজায়িজ। কিন্তু এ বৈধতার পক্ষে স্পষ্ট কোনো দলিল নেই।

২. থানবি রাহ, ইমদাদুল ফাতাওয়ায় এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি এর নাম দিয়েছেন 'উজালায়ে কাশফুল হিজাব আন মাসআলাতি তাজিমি বাজিল আনসাব।' তিনি তাঁর ফাতওয়ায় একে নাজায়িজ ও অনৈসলামিক কাজ বলে মন্তব্য করেছেন এবং এর পক্ষে দলিল-প্রমাণ পেশ করেছেন।

ইসলামে সাংস্কৃতিক ঐক্যের কোনো অবকাশ নেই

কুরআনের এবং হাদিসে ইবাদতের ক্ষেত্রেও বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্যকরণ কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।সেখানে অমুসলিমদের সাথে সাংস্কৃতিক ঐক্যের ত প্রশ্নই আসে না।

মুসলিম উম্মাহ সকল জাতির ভিড়েও স্বকীয় পরিচয় বহন করে থাকে। শক্তিমত্তা বা দুর্বলতা যা-ই থাকুক না কেন, ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ না করা মুসলিমদের সবচেত্রে বড় বৈশিষ্ট্য।

পৃথিবীর অন্য কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের এই বৈশিষ্ট্য নেই। তাদের জাতীয় ও রাজনৈতিক জীবনে ধর্ম কখনো শক্তিশালী উপাদান হিসেবে ছিল না

ইতিহাস আমাদের বলে, সাংস্কৃতিক ঐক্য ও বিনিময়ের এই প্রচারণা নতুন নয়। সব যুগেই কাফিররা কামনা করে এসেছে, ইমানদাররা তাদের স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে সাংস্কৃতিক ঐক্যের নামে তাদের দলে নাম লেখাবে। কুরআনে আল্লাহ বলেন:

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَا

তারা চায় তোমরাও তাদের মতো কাফির হয়ে যাও। [সুরা নিসা: ৮৮)
এমন ঐক্য ইসলামে পরিত্যাজ্য, যা ইসলাম থেকে আমাদের টেনে বের করে কুফরির দিকে নিয়ে যায়, নিয়ে যায় শয়তানের পথে ও জাহান্নামের দিকে। দয়াময় প্রভুর জান্নাত ছেড়ে জাহান্নামে যাওয়ার রাস্তা তো অবশ্যই বর্জনীয়।

পবিত্র কুরআন যে বিধানগুলো দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করেছে, মুসলিমদের সেগুলো বেশি গুরুত্ব দিয়ে মেনে চলা উচিত। যেমন:

(ﱡيَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِين হে ইমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হয়ে যাও, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সুরা বাকারা: ২০৮]

এ আয়াতের ঐতিহাসিক পটভূমির দিকে তাকালে আলোচ্য বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে কেবল ইসলাম গ্রহণ করলে হচ্ছে না, এ আয়াতে ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করতে বলা হয়েছে, যেন এর সঙ্গেঙ্গ অন্য কোনো ধর্ম বা সম্প্রদায়ের চিহ্নও না থাকে।

১০ শব্দটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধিকাংশ মুফাসসির বলেন, এ আয়াত কেবল নও- মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য নয়। ইসলামগ্রহণ করলে এর সব শর্ত ও বিধানও গ্রহণ করা আবশ্যক। **অর্ধেক ইসলাম বা মিশ্রিত ইসলাম আল্লাহ ও রাসুলের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।**

অমুসলিম রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস:প্রেক্ষাপট ও মাসয়ালা

অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করা ,

: কোন অমুসলিম রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করা, সে দেশের ন্যাশনালিটি বা নাগরিকত্ব গ্রহণ করা এবং সে দেশের নাগরিকদের সমান আবাসন সুযোগ এবং সমান নাগরিক সুবিধা গ্রহণ করে স্বতন্ত্রভাবে নিজের আবাসস্থল গড়ে তোলা, এমন একটি বিষয় যার হুকুম স্থান-কাল-পাত্রভেদে এবং বসবাসকারীদের উদ্দেশ্য এবং চিন্তাধারার ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন

১.

যদি কোন মুসলমানের ওপর স্বদেশে কোন অন্যায় অভিযোগ ও অপরাধ ছাড়াই অত্যাচার নির্যাতন চালানো হয়, বেআইনিভাবে কারাগারে অন্তরীণ করে রাখা হয় অথবা তার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেয়া হয়; এমতাবস্থায় কোন অমুসলিম রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া এসব জুলুম অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়ার যদি কোন পথ খোলা না থাকে, তাহলে এই অবস্থায় ওই ব্যক্তির জন্য অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করা এবং সেই দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে তথায় অবস্থান করা নিঃসন্দেহে জায়েয হবে। তবে শর্ত হল এই যে, তাকে এ ব্যাপারে প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে যে, সে সেখানে গিয়ে তার জীবন চলার পথে ধর্মীয় অনুশাসন পুরোপুরি মেনে চলবে। সেখানকার প্রচলিত যাবতীয় মন্দকাজ ও কুসংস্কার থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে।

,

এর দলিল হল, সাহাবাগণ মক্কায় কুরাইশদের কাছে নিগৃহীত ও নির্যাতিত হয়ে হাবশায় হিজরত করেছিলেন। তখন হাবশায় কাফেরদের রাজত্ব চলছিল। তখন সাহাবায়ে কেরাম সেখানে অবস্থান করেছেন। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করে যাওয়ার পরও কোন কোন সাহাবী সেখানে অবস্থান করেছিলেন। হযরত আবু মুসা আশআরী (রাযি.) খায়বার যুদ্ধের সময় ফিরে এসেছিলেন। তখন ছিল হিজরী সপ্তম বছর। আর মানুষের আত্মিক অধিকার হল যে, সে তার নফস বা আত্মাকে যে কোন ধরনের অন্যায় ও জুলুম থেকে নিরাপদে রাখবে। সুতরাং যদি সে কোন কাফের রাষ্ট্র ছাড়া নিজের জন্য কোন নিরাপদ স্থান না পায় তাহলে তার জন্য সেখানে হিজরত করাতে কোন বাধা-প্রতিবন্ধকতা নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার ধর্মীয় দায়িত্ব সমূহ যথাযথভাবে পালন করতে সচেষ্ট হবে এবং হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবে।

২/

. এমনিভাবে যদি কোন ব্যক্তি অর্থনৈতিকভাবে চরম সঙ্কটে নিপতিত হয়; এবং বহু চেষ্টা-প্রচেষ্টার পরও যদি নিজের মুসলিম রাষ্ট্রে জীবিকানির্বাহের কোন সুযোগ সৃষ্টি না হয়, এমনকি এখানে সে এক মুঠো খাবারেরও মুখাপেক্ষী হতে হয়। এমতাবস্থায় যদি কোন অমুসলিম রাষ্ট্রে তার বৈধ কোন চাকরির ব্যবস্থা হয়ে যায়, আর এই সুযোগে যদি সে সেই অমুসলিম দেশে বসবাস শুরু করে দেয়, তাহলে [এক নম্বর উত্তরে বর্ণিত দুইটি শর্তের সাথে] তার জন্য সেখানে বসবাস করা জায়েয হবে। কেননা অন্যান্য ফরয সমূহের মধ্যে হালাল উপার্জন ও একটি অন্যতম ফরয। যার জন্য শরীয়ত কোন স্থান বা কোন জায়গাকে সীমাবদ্ধ করে। দেয়নি; বরং এর জন্য রয়েছে ব্যাপকতর সাধারণ অনুমতি। পবিত্র কুরআনের আয়াতে হালাল জীবিকা উপার্জনের জন্য যে কোন স্থানে গমণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور

'তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন। অতএব তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর এবং তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে।' (সূরা মূলক : আয়াত ১৫)

৩/

. এমনিভাবে যদি কোন ব্যক্তি কোন মুসলিম রাষ্ট্রে এই নিয়তে বসবাস করে যে, সে দেশে অবস্থানরত অমুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাবে, তাদেরকে মুসলমান বানাবে অথবা সেখানে অবস্থানরত মুসলমানদের দ্বীন ও শরীয়তের সহীহ তালিম দেবে। দ্বীনের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য এবং শরীয়তের আহকাম ও বিধিবিধান অনুযায়ী আমল করার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করবে। এ জাতীয় নিয়তে অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করা শুধু জায়েযই নয় বরং এটি একটি বিরাট সওয়াব ও পুণ্যময় কাজ। অসংখ্য সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এই মহৎ উদ্দেশ্য ও সৎ নিয়ত নিয়ে বিভিন্ন অমুসলিম দেশে বসবাস করেছেন। পরবর্তীকালে এগুলো তাদের জীবনে উত্তম ও সৎকর্ম এবং তাদের বর্ণাঢ্য জীবনের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

৪/

. যদি স্বদেশে কোন ব্যক্তির এই পরিমাণ জীবিকার বন্দোবস্ত থাকে, যার মাধ্যমে সেই শহরের অবস্থানরত অন্যান্য মানুষের জীবন চলার মান অনুযায়ী সেও চলতে সক্ষম হয়। কিন্তু তারপরও শুধু জীবন চলার মান আরো উন্নত করার উদ্দেশ্যে, সম্পদ বৃদ্ধি এবং আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের জীবন যাপনের লক্ষ্যে অমুসলিম রাষ্ট্রে হিজরত করে থাকে, তাহলে এ জাতীয় হিজরত মাকরুহর আওতাভুক্ত হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা কোনরূপ ধর্মীয় বা পার্থিব প্রয়োজন ছাড়া সেই রাষ্ট্রে বসবাস তাদের প্রচলিত অপসংস্কৃতির স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়ারই নামান্তর হবে। বিনা প্রয়োজনে নিজের দ্বীন-ধর্ম এবং আখলাক-চরিত্রকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া কোনক্রমেই ঠিক হবে না। কেননা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কেবল আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস এবং সুখ-স্বর্গের জীবন যাপনের লক্ষ্যে অমুসলিম

রাষ্ট্রে বসবাস করে থাকে, তার মাঝে ধর্মীয় অনুভূতি দুর্বল হয়ে যায় এবং খুব দ্রুতই এ ধরনের মানুষ বিধর্মীদের আচার-আচরণের জোয়ারে নিজেদের ভাসিয়ে দেয়।

এ কারণেই হাদীস শরীফে তীব্র প্রয়োজন ছাড়া মুশরিকদের সঙ্গে বসবাস করার নিষেধাজ্ঞা এসেছে। এ সম্পর্কে আবু দাউদ শরীফে হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাযি.) থেকে একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله

'যে ব্যক্তি মুশরিকদের সঙ্গে মেলামেশা করে এবং তাদের সঙ্গে বসবাস করে, সে তাদেরই মত।' (আবু দাউদ)

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম ইরশাদ করেছেন :

أ

نا بربي من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا يا رسول الله لم؟ قال لا ترى أي ناراهما .

'আমি ওইসব মুসলমানদের থেকে দায়মুক্ত যারা মুশরিকদের সঙ্গে বসবাস করে। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এর কারণ কী? জবাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- ইসলামের অগ্নি আর কুফুরের অগ্নি একই সঙ্গে থাকতে পারে না। তোমরা এটি পৃথক করতে পারবে না যে, এটি কি মুসলমানদের অগ্নি না মুশরিকদের অগ্নি।' (আবু দাউদ, তিরমিযী)

আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে। বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের অনেকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ইরশাদের ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্নভাবে। যেমন কোন কোন বিজ্ঞ আলেমের কাছে এর অর্থ হল এই যে, হুকুমের ক্ষেত্রে মুসলমান আর মুশরিক সমকক্ষ হতে পারে না। উভয়ের আহকাম ভিন্ন ভিন্ন। আবার কোন কোন আলেম বলেছেন, এই হাদীসটির সারমর্ম হল এই যে, আল্লাহ তাআলা দারুল ইসলাম এবং দারুল কুফরকে ভিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছেন। সুতরাং কোন মুসলমানের জন্য কাফেরদের রাষ্ট্রে তাদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করা জায়েয নেই। কেননা যখন মুশরিকরা তাদের (বিজয়ের) মশাল সমুজ্জল করবে, আর তাদের সঙ্গে মুসলমানরা নীরবতা অবলম্বন করে থাকবে, তখন বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটিই মনে হবে যে, তারা (মুসলমানরা) এদেরই অন্তর্ভুক্ত। ওলামায়ে কেরামের এই ব্যাখ্যা দ্বারা একথাও পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে যে, যদি কোন মুসলমান ব্যবসা

বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেও কাফেরদের রাষ্ট্রে গমণ করে, তাহলে তার জন্য সেখানে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় অবস্থান করা মাকরূহ।' (মাআলিমুস সুনান লিল-খাত্তাবী : [আবু সুলায়মান আল খাত্তাবী, মৃত্যু : ৩৮৮ হি.] খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৩৭)

হযরত মাকহুল (রাযি.) থেকে সুনানে আবু দাউদের মারাসিলে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম ইরশাদ করেছেন :

لا تتركوا الذرية ازاء العدو.

‘নিজের সন্তানদের মুশরিকদের মধ্যে বিচরণ করতে দেবে না।

এ কারণেই ফুকাহায়ে কেরাম অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, কেবলমাত্র চাকরি করার উদ্দেশ্যে কোন মুসলমানের অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করা এবং তাদের জনসংখ্যা বর্ধিত করার কারণ হওয়া এমন একটি (ধিকৃত) কাজ, যার দ্বারা তার বিশ্বস্ততা ক্ষুণ্ন হয়ে যায় ।

৫/

. কোন ব্যক্তি যদি লোক সমাজে সম্মানিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় কিংবা অন্য মুসলমানের ওপর নিজের বড়ত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করে কিংবা দারুল কুফরের নাগরিত্ব এবং জাতীয়তাকে দারুল ইসলামের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে তাকে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত মনে করে তাদের ন্যাশনালিটি গ্রহণ করে থাকে অথবা তার পার্থিব জীবনের থাকা-খাওয়া ও চাল-চলনে তাদের নীতি গ্রহণ করে বাহ্যিক জীবনে তাদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করার জন্য এবং তাদের মত হয়ে যাওয়ার জন্য বসবাস করে থাকে তাহলে এ জাতীয় যে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করা সম্পূর্ণরূপে হারাম হিসেবে গণ্য হবে। এই বিষয়টি এমন সুস্পষ্ট যে, এর জন্য কোন দলিল পেশ করা প্রয়োজন নেই।

রেফারেন্স

অমুস্লিম দেশে মুসলিম জীবনযাপন,সমস্যা ও শরয়ী সমাধান
-মুফতী আখতার ইমাম আদিল কাসেমী

https://muslimbangla.com/blog/533

https://www.pewresearch.org/short-reads/2018/01/26/the-share-of-americans-who-leave-islam-is-offset-by-those-who-become-muslim/

https://www.ifatwa.info/3447
https://www.ifatwa.info/5275/
https://www.hadithbd.com/books/link/?id=627
https://muslimbangla.com/masail/10776
https://images.app.goo.gl/h3HAQo6na6wzAq9Q9
https://www.alkawsar.com/bn/article/1246/
https://www.hadithbd.com/books/fullbook/?book=49
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:dac5b0eb-74a0-470b-b9b1-004ab468223e